কে এই স্যর বিদ্যাধর সুরজ-পরসাদ নাইপল, কাদের লোক ?

আলোচনা করছেন অভিজিৎ মুখার্জি

A Brief Introduction of Sir V S Naipaul for the Bengali Readers

কে এই স্যর বিদ্যাধর সুরজ-পরসাদ নাইপল, কাদের লোক?

অভিজিৎ মুখার্জি

উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমার সঙ্গে আসতে চাও ?', আনন্দ অল্প একটু হাসে, তারপর মুখ নিচু করে। বুড়ো আঙুল দিয়ে সাইকেলের প্যাডেলটা ঘুরিয়েই যায়।

শিগগিরি অন্ধকার হয়ে যাবে। মিঃ বিশ্বাসের সাইকেলে আলো নেই... বড় রাস্তা ধরে উনি চালাতে শুরু করলেন। 'লাল-গোলাপ চা, ভালো চা', এই সাইনবোর্ডটা ছাড়িয়েই পেছনে একবার তাকালেন। গোল দরজার নিচে আনন্দ তখনও দাঁড়িয়ে আছে, একটা মোটা সাদা থামের পাশে। থামটার গোড়াতে একটা বড় পদ্মের ছাঁচ; আরেকদিন সূর্য ডোবার মুহূর্তে মিঃ বিশ্বাস এক জায়গায় একটা নিচু কুঁড়ের সামনে যে একটা ছেলেকে দেখেছিলেন, ঠিক তার মতো করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গ্রীণ-ভেলে পৌঁছোতে পৌঁছোতে পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে। গাছের নিচে তখন রাত। আওয়াজ যেগুলো ভেসে আসছিল ব্যারাকের দিক থেকে, জোরালো, কিন্তু বিক্ষিপ্ত —কিছু টুকরো কথা, রান্নাঘরের ছ্যাঁকছোঁক, এক আধটা চড়া গলায় কথা, হয়তো একটা বাচ্চার কান্না : একটা অকিঞ্চিতকর জায়গা থেকে নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া সব আওয়াজ। দ্বীপটার মানচিত্রে একটা বিন্দু থেকে, যে দ্বীপটাই কিনা পৃথিবীর মানচিত্রে একটা বিন্দু। স্তব্ধ গাছেরা ব্যারাকটাকে ঘিরে আছে, যেন নিশ্ছিদ্র কালো একটা দেওয়াল।

স্যর ভি এস নাইপলকে বুঝতে চাইলে ওপরের এই অংশটুকু বারবার ধীরে ধীরে পড়ুন, কল্পনা করার চেষ্টা করুন সবটা। এত উপন্যাস, নন-ফিকশনের জন্য খ্যাতির পরেও নাইপল বললেই এযুগের যে এপিক উপন্যাসটার নাম সঙ্গেই উঠে আসে, সেই 'এ হাউজ ফর মিস্টার বিশ্বাস' থেকে নেওয়া একটা অংশ। কাহিনীর এই আনন্দ হয়তো উনি নিজে, মিঃ বিশ্বাস ওঁর বাবা। সেই ইঙ্গিত বারবারই উপন্যাসের বাইরেও নানা সূত্রে পাওয়া গেছে। একজন অসহায় দুর্বল মানুষের ট্র্যাজেডির ছবি। নিজের ছেলে, স্ত্রী থাকে শ্বশুর বাড়িতে। ওঁর কোনও নিজস্ব ঠাঁই নেই, নিজের সত্ত্বার, অস্তিত্বের, পরিচয়ের যাবতীয় অংশের থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে এক অকিঞ্চিতকর জীবন, এক অকিঞ্চিতকর বিন্দুতে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অস্তিত্বে।

আর এটাই কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের এক বৃহদাংশের ট্র্যাজেডিও বটে। উপনিবেশের দেশগুলোর ঔপনিবেশিক পরিণতিতে, নিজের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা, দর্শনে, অভিব্যক্তিতে, ভাষায়, জ্ঞানচর্চায়, শিল্পে, নৈতিকতার ধারণায়, এই সব কিছুতে পরনির্ভরতায় নিয়ন্ত্রিত হওয়া এক অকিঞ্চিতকর প্রান্তিক অস্তিত্বের কথা কে না জানে। উপনিবেশের মানুষগুলোর সাহিত্যে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে ধারাটি, যাকে উপনিবেশিকোত্তর সাহিত্যের একটা মুখ্য অংশই বলা যায়, তারই অবিসংবাদিত প্রধান পুরুষ এই স্যর ভি এস নাইপল, সাহিত্যের ইতিহাসেরই এক বিস্ময় পুরুষ। ইতিহাসের এই পর্যায়টার উনি নাম দিলেন, 'নতুন পৃথিবী', আমরা যেটাকে বলছি পোস্ট-কলোনিয়াল। একদিকে উপনিবেশ লুণ্ঠন করে আসছে সম্পদের স্রোত, অন্যদিকে শিল্পবিপ্লবের হাত ধরে নিশ্চিত করা হচ্ছে বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, চিকিৎসায়, প্রত্নতত্ত্বে, সমস্তরকম জ্ঞানচর্চায় একসহস্র বছরের জন্য প্রাধান্য, তৈরি হচ্ছে সেই আন্তর্জতিক সম্পর্কের ভিত্তি যেখানে উপনিবেশকারিই চেতনার কেন্দ্র, নৈতিকতার একমাত্র নিয়ামক ও ইতিহাসে নির্ধারক, উপনিবেশ নিজেকে চিনবে কেন্দ্রেরই আলোয় প্রান্ত হিসেবে। এই যে প্রায় চিরস্থায়ী এরকম একটা বন্দোবস্তো, এটা এল কোন পথে, কীভাবে? ইতিহাসের, সাফল্যের আলোয় আলোকিত দিকগুলো খানিক জানা যায় গ্রন্থিত ইতিহাস থেকে। কিন্তু অসাফল্যের, হারিয়ে যাওয়ার, পরাভূত হওয়ার ইতিহাসগুলোতো অন্ধকারেই রয়ে গেছে। ভারত থেকে উনবিংশ শতক জুড়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ত্রিনিদাদে আখের ক্ষেতে চাষ করতে। চুক্তির শর্ত ছিল যে চুক্তির মেয়াদ ফুরোলে এদের দেশে ফেরার জাহাজের টিকিট ধরিয়ে দেওয়া হবে,

আর থোক কিছু টাকা। কিন্তু ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে উঠে গেল এই চুক্তিবদ্ধ দাসত্ব প্রথা। ত্রিনিদাদের ওই শ্রমিকগুলোর তখন কী হবে? বিদ্যাধরের দাদুও গিয়েছিলেন ওদের সঙ্গেই পূর্ব-ইউপি থেকে ১৮৮০-র দশকে, জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ বলে পুরোহিত হিসেবে। লোকগুলো তখন রাস্তায় ঘাটে শুয়ে থাকত, চুক্তি আর বলবৎ নেই, কাজ নেই, দেশে ফেরার টিকিটও আর পাওয়া যায়নি। এদের সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতো না, এরা কারা, কোত্থেকে এলো, কোথায়ই বা যাবে! এভাবেই পৃথিবীর বহু কোণের ইতিহাস আলোকিত বৃত্তের বাইরে প্রায়ন্ধকার ছায়া, উপচ্ছায়া, প্রচ্ছায়ায় পড়ে আছে স্মৃতির অগোচরে।

তরুণ বয়েসেই লিখতে গিয়ে দেখলেন, অনুসরণ করার মতো কোনও পূর্বসূরি নেই! তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের নিয়ে, সমাজ নিয়ে, ইতিহাস নিয়ে যা কিছু লেখা, তা সব বিদেশি উপনিবেশকের অভিজ্ঞতা থেকে। তাদের আংশিকতাদুষ্ট খতিয়ানের বাইরে নিজের শেকড়ের কিছু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ১৯৬২-তে নিজের উৎস সভ্যতা ভারত দেখতে এসে যে বই লিখলেন, তার নাম দিলেন, ইন্ডিয়া: অ্যান এরিয়া অব ডার্কনেস। পরে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি জরুরি অবস্থার সময়ে আবারও ভারতে এসে, সব দেখে-টেখে লিখলেন, ইন্ডিয়া: দ্য উন্ডেড সিভিলাইজেশন। ভর্ৎসনায় ক্ষমাহীন ভাবে দেখালেন কীভাবে দেশটার ভাবমূর্তি, পরিচয়টা, দেশেরই লোকের কাছে আটকে রয়েছে সেই সুদূর অতীতের কিছু মিথ আর ধারণার মধ্যে, সময়কে স্বীকৃতি দিয়ে, ইতিহাসকে স্বীকৃতি দিয়ে, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে মোটেই বিবর্তিত হয়নি। নিজের শেকড়টা ডার্কনেসের মধ্যে, যে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ হিসেবে পরিচয়, সেই তৃতীয় বিশ্বের ইতিহাসের অধিকাংশটা আবছায়া আর ডার্কনেসের মধ্যে, অকিঞ্চিতকরদের মধ্যে জন্ম, জীবনের শুরু। অবচেতনে এসবগুলোর গ্লানিরই প্রতিফলন কি আমরা গ্রীনভেলের ব্যারাকের ওই রাত্রির বর্ণনার মধ্যে খুঁজে পেয়েছি বলে ভাবব না? অথচ ২০০১এ নোবেল পুরস্কার গ্রহণের সময় বক্তৃতায় অগ্রজ ফরাসি সাহিত্যিক প্রুস্তকে উদ্ধৃত করে বললেন, "... একটা বই বেরিয়ে আসে একটা অন্য সত্ত্বা থেকে। আমাদের রোজকার অভ্যাসে, আমাদের সামাজিক জীবনে, এমনকি আমাদের পাপাচারে যে সত্ত্বার প্রকাশ, এ তার থেকে ভিন্ন। এই বিশেষ সত্ত্বাটিকে চেনার চেষ্টা করলে যেতে হবে আমাদের একেবারে অভ্যন্তরে। সেইখানে পুনর্নির্মাণ করতে হবে..." সঙ্গে এও বললেন, "আমি বলব, আমার সমস্ত লেখাকে একসঙ্গে করলে তবে আমি। প্রত্যেকটা লেখা... যা তার আগে পর্যন্ত ঘটে গেছে, তার ওপর দাঁড়িয়ে এবং তার থেকেই তৈরি হওয়া। আমি বিশ্বাস করি, আমার সাহিত্যজীবনের যে কোনো পর্যায়ে বলা যেতে পারত যে আমার সর্বশেষ লেখাটাতে ধরা আছে বাকি সমস্ত লেখাগুলো।" কী বলব, স্ববিরোধ, না কি ব্যতিক্রমহীন ধারাবাহিকতা? সে যা-ই হোক, স্ববিরোধিতাও লেখকের সততারই নিদর্শন, স্ববিরোধিতা এড়াতে পারে একমাত্র প্রচারমূলক অভিসন্ধিই, যথেষ্ট সতর্ক থাকলে, কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের উচ্চতম স্তরের স্বীকৃতি তাতে মেলে না।

১৯৩২-এ জন্মে, অসম্ভব দারিদ্রের মধ্যে বেড়ে উঠছিলেন কৈশোরে, আর ভুগছিলেন নিরাময়হীন হাঁপানিতে। খুব বেশিদিন সেভাবে টিঁকে যাওয়ার আশা প্রায় ছিলই না। স্কুলস্তরের সর্বশেষ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে, পুরো দ্বীপটার জন্য বরাদ্দ একটি মাত্র স্কলারশিপ পেয়ে এসেছিলেন বিলেতে, অক্সফোর্ডে। বেঁচে গিয়েছিলেন। বিলেতে আসার সময় জাহাজে সর্বক্ষণের সঙ্গী একখানা ডায়েরি, আকাঙ্ক্ষা ছিল বিশ্ববিখ্যাত সব পর্যটন-সাহিত্যিকদের আদলে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন যাবতীয় অভিজ্ঞতা। কিন্তু, হা হতোস্মি, তাঁরা ছিলেন সব সাহেব, উপনিবেশ স্থাপনকারি জাতির লোক, আর এ কিশোর তো উপনিবেশের কৃষ্ণাঙ্গ! বহুদশক বাদে সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে, 'দ্য এনিগমা অব অ্যারাইভাল' বইতে লিখছেন, "লেখক হিসেবে আমি তখন আমার অভিজ্ঞতাগুলোকে আমার নিজেরই কাছ থেকে আড়াল করছিলাম। নিজেকে আড়াল করছিলাম নিজের অভিজ্ঞতার থেকে... একটা লড়াই, একদিকে পর্যটক লেখকের গ্ল্যামার, আর আরেকদিকে উপনিবেশের লোকেদের মধ্যে তাদেরই একজন হওয়া সত্ত্বেও পর্যটক ভাব করার স্নায়ুর চাপ—লেখার পক্ষে খুবই প্রতিকূল।" বোঝাই যায়, লেখক হিসেবে নিজের সঠিক পথটি খুঁজে নেওয়া খুব সহজ হয়নি, তৃতীয় বিশ্ব থেকে আসা ইংরিজি সাহিত্যের এই অগ্রগণ্য লেখকটির পক্ষে। কিন্তু লিখতে যে হতই! অক্সফোর্ড থেকে বাবার কাছে লেখা চিঠিতে রয়েছে : দ্যাখো, মানুষ একটা কোনো কাঠের টুকরো নয় যে তাকে বিদেশ পাঠানো হল আর শিক্ষার দুটো ছাপ তার গায়ে খোদাই হল। তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। তার অনুভূতি আছে। চিন্তা আছে। কারও কারও আবার অনুভূতি বেশি, চিন্তার শক্তিও বেশি। তাদের

কষ্টও বেশি। সংবেদনশীল মানুষ অন্যের চেয়ে সুখী অথবা মহান, এটা ভাবা মোটেও ঠিক নয়। কেননা শেষ অবধি কারুর কাছেই তোমার ট্র্যাজেডির কোনও দাম নেই যদি না তুমি সেটা লাগসই করে প্রকাশ করতে পার। অথচ তার জন্য চাই মনকে খানিকটা শান্ত রাখা।"

বিশ্বের যে একশোটা উপন্যাস একজন সাহিত্যপ্রেমীকে পড়তেই হবে, সেই তালিকায় নাইপলের যে উপন্যাসটি স্থান পেয়েছে, তার নাম, 'এ বেন্ড ইন দ্য রিভার'। উপন্যাস শুরু হচ্ছে যে লাইনটা দিয়ে সেটা হল : The world is what it is; men who are nothing, who allow themselves to become nothing, have no place in it. উপন্যাসের এক চরিত্র, পূর্ব আফ্রিকার এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত, ইন্দার বলছে, "রথস্‌চাইল্ডরা আজ যা হতে পেরেছে তার পেছনে আছে সঠিক সময়ে তাদের ইয়োরোপকে বেছে নেওয়া। যোগ্যতায় কোনও অংশে খাটো নয় এমন অন্য ইহুদিরা, যারা কারবার খুলেছিল ওটোমান সাম্রাজ্যে, অথবা তুরস্কে বা মিশরে, যেখানেই হোক, তাদের কিন্তু সেই সমৃদ্ধি হয়নি। কেউ তাদের নাম জানে না। এবং আমরাও শতাব্দীর পর শতাব্দী ঠিক এইটাই করে আসছি। আমরা হেরে যাওয়াকেই নিয়তি হিসেবে আঁকড়ে থেকে ভুলে বসে আছি আমরাও ঠিক অন্যদের মতোই মানুষ। সবসময় ভুল দিক বেছে নিয়েছি। হারতে হারতে আমি ক্লান্ত। আমি সেই ভিড়ে মিশে যাব না... এবার থেকে জিততে চাই, জিততে চাই, জিততে চাই।" আরেক ভারতীয় সেলিম, সে কিন্তু সাফ বোঝে, "অন্যদের মতোই ইয়োরোপীয়ানদের দরকার ছিল সোনা আর ক্রীতদাস। কেবল, সেই সঙ্গে তারা চাইল যে এইসব ক্রীতদাসদের ত্রাতা হিসেবে তাদের মূর্তিও বসুক... তাদের সভ্যতার এই দুটো দিকই তাদের কাজে প্রকাশ পেয়েছে। তারা ক্রীতদাস আর মূর্তি, দুটোই হাসিল করেছে। এটা তারা পেরেছে কারণ তাদের আত্মসমীক্ষায় গাফিলতি ছিল না। পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে তাদের প্রস্তুতি ছিল বেশি... তাদের প্রাথমিক দায় ছিল নিজেদের ইয়োরোপীয় সভ্যতার কাছে। এখানেই তাদের তুলনায় আমাদের দুর্বলতা মারাত্মক।"

এই তৃতীয় বিশ্বেরই একটা মুখ্য অংশ আজকের ইসলামিক বিশ্বের দেশগুলো। আরব দেশগুলোর বাইরে যে ইসলামিক সভ্যতা, তার চারটি দেশ ঘুরে এসে লিখেছিলেন, প্রথমে, 'অ্যামাং দ্য বিলিভারস' আর তার কিছু পরে আরেকবার ঘুরে এসে, 'বিয়োন্ড বিলিফ'। এই নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। নাইপলকে তার জীবনভর সাহিত্যিক/ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে উনি ইসলামি সভ্যতাকে ছোট করে দেখিয়েছেন। অথচ, এ যাবত এখানে যা লিখলাম, তার পরিপ্রেক্ষিতে যখন আমরা পড়ব উনি ঠিক কী লিখেছিলেন, বুঝবো যে নিজের ইতিহাসের এক শরিক হিসেবেই আজকের ইসলামিক সভ্যতার দুর্বলতার দিকটাকে উনি উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। ইরানের এক লেখকের লেখা উপন্যাসের একটি ডাক্তার চরিত্রের দিকে নির্দেশ করে আজকের ইসলামিক আদর্শ সম্বন্ধে লিখলেন :

"মনন এবং উদ্যমের জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে... তারা আবার আবিষ্কার করবে তাদের আত্মসম্মান, পূর্ণতা, আর এই ভাবে পবিত্র হয়ে উঠবে... এবং জীবন চলতেই থাকবে। আত্মিক দিক থেকে উষর অন্য কোথাও, অন্য লোকেরা সেইসব যন্ত্র তৈরি করবে যা নিজের কাছে আছে বলে ডাক্তারের গর্ব, চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণা পত্রিকা বের করবে যা পড়ে ডাক্তারের গৌরব।

এই যে ভরসা— অন্যরা সৃষ্টি করবে, অন্য বিদেশি সভ্যতা অটুট থাকবে- এটা কিন্তু অন্তর্লীন ভাবে রয়ে গেছে এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে, পরিহারের মধ্যে। এটাই এর মস্ত ত্রুটি।"

ইসলাম বিরোধি হলে, নিজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র, ভারতীয় যুবকটির নাম রাখতেন না সেলিম।

বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে, প্রযুক্তিতে, আন্তর্জাতিক নৈতিকতায়, আরো সব দিক দিয়ে এক হাজার বছরের জন্য এখন প্রথম বিশ্বটিই কেন্দ্র, তৃতীয় বিশ্বটি প্রান্তিক। শুধু ভাষার ব্যবহারে, ইতিহাসের মৌলিক বয়ানে চোখ ঝলসে দেওয়া একাকী যোগ্যতায় নিজেকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করে, এরিয়া অব ডার্কনেস থেকে উঠে এসে তৃতীয় বিশ্বকে জয় এনে দিয়েছেন যে একটি মাত্র মানুষ, তাঁর নাম ভি এস নাইপল, স্যর বিডিয়া!

---------------২০১৫